

মুক্তির ছাড়পত্র – বার্ধক্য

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

সারসংক্ষেপ : মানব জীবন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় এবং পরিশেষে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। সাধারণভাবে ‘বৃদ্ধ’ শব্দটির মধ্যে ক্ষয়, অক্ষমতা, দুর্বলতা, দুঃখ এই ধরনের কিছু নঞর্থক চিন্তা সম্পৃক্ত থাকে। কারণ বৃদ্ধ বলতেই আমরা এক অক্ষম, দুঃখজর্জরিত, বা দুর্বল মানুষকে বুঝে থাকি। ফলত মানব জীবনে এই পর্যায় উপস্থিত হওয়ার পূর্ব থেকেই অনেক মানুষ ‘বার্ধক্যে উপনীত হলে অক্ষম হয়ে পড়বে, সবাই অবহেলা করবে’ এই ভেবে অবসাদ গ্রস্ত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ দর্শনে বার্ধক্যকে দুঃখ বলা হয় এবং এই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়ও নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু বার্ধক্য শুধু নঞর্থক এক অবস্থা নয় বা বার্ধক্য এক দুঃখজনক অবস্থা নয়, বার্ধক্য মানব জীবনের এক অনিবার্য পরিণতি, একটি পর্যায় বা স্তর। বার্ধক্যে বেশ কিছু সমস্যা অবশ্যই আছে, যাকে আমরা বার্ধক্যে দুঃখ বলতে পারি। এই দুঃখগুলি কিভাবে জয় করা যাবে তার জন্য সমাজকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে, ঠিক তেমনি বৃদ্ধব্যক্তিদের নিজেদেরও তার উপায় বার করতে হবে। বার্ধক্য মানুষকে পরিণত করে সুসংস্কৃত হতে, সুমার্জিত হতে, সুসংশোধিত হতে; একটি পরিপূর্ণ মানুষ হতে সাহায্য করে। শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করতে হবে, বার্ধক্যের নতুন ফসল অভিজ্ঞতা- যা বৃদ্ধব্যক্তির গভীরতর জীবনবোধ জাগ্রত করে, তার নিরিখে বৃদ্ধব্যক্তিকে নিজের মূল্যায়ন করতে হবে। তাই বার্ধক্যকে দুঃখ ভেবে তা থেকে মুক্তির কামনা নয়, বরং বার্ধক্য যে নতুন জীবনবোধ

নিয়ে আসে তা বৃদ্ধব্যক্তিকে দেয় মুক্তির ছাড়পত্র। সংসারের ছোটখাটো বন্ধন বৃদ্ধব্যক্তিকে আর আবদ্ধ করতে পারে না, সমাজের মঙ্গলার্থে তার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যায় সুবিশাল দ্বার। শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করে মনের শক্তির দ্বারা সে এগিয়ে যাবে ঐ সুবিশাল দ্বার দিয়ে সমাজের কল্যাণ করতে, এতদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, জীবনবোধকে কাজে লাগানোর উত্তম সময় হল বার্ধক্য। এই প্রবন্ধে দেখার চেষ্টা করেছি বার্ধক্য অবহেলার নয়, দুঃখের নয়, জীবন যেহেতু ঈশ্বরের দান, আর এই জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বার্ধক্য। এই বার্ধক্যই মানবজীবনকে সম্পূর্ণ বা পূর্ণতর করে তোলে।

মূলশব্দ : জরা, রসায়নতত্ত্ব, দুঃখ, অক্ষমতা, আয়ুর্বেদ, বার্ধক্য, মুক্তি

ভূমিকা : বিগত কয়েক দশকের মধ্যেই সারা জগতে বার্ধক্যের সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা গবেষণা পরিকল্পনার দরুণ কর্মচাঞ্চল্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও বর্তমান দিনে বার্ধক্য সংক্রান্ত আলোচনা একটি চর্চিত বিষয়। এখন প্রশ্ন হল বর্তমান দিনে বার্ধক্য বলতে কি বোঝানো হয়? সাধারণভাবে বলা যায়, বার্ধক্য একটি স্বাভাবিক জৈবিক ঘটনা এবং মস্তুর আনুকূল্য গতিতে এগিয়ে আসা দৈহিক অবক্ষয় যার ফলে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মক্ষমতা এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর অবধারিত পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। সংখ্যাাত্মিক দিক থেকে মানুষের অবসরগ্রহণের বয়সকে বার্ধক্যের সূত্রপাত বলে মনে করা হয়। দীর্ঘকাল যাবৎ ৬০ বছর বয়সকেই অবসরগ্রহণের বয়স বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। বর্তমান দিনে ভারতবর্ষেও ৬০ বছর বয়সকে বার্ধক্যের সূচক হিসাবে মান্য করা হয়। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, বিভিন্ন ঔষধের আবিষ্কারের ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, তার ফলে সমাজে বৃদ্ধব্যক্তিদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।⁽ⁱ⁾ দেখা যায় ভারতে ১৯২০ সাল থেকে বার্ষিক মৃত্যুর হার কমতে থাকে এবং ১৯৭০ সাল থেকে জন্মহার নিয়ন্ত্রিত হয় (Devis 1951, 28), ফলে একদিকে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পায় আর অন্যদিকে বৃদ্ধব্যক্তিদের গড় অনুপাত বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “on the other hand, the percentage of aged population 60+ has risen to well over 6 percent since the year 1981. It was found to be 7.4 percent(nearly 77 million) of the total population constitute the aged in the age group 60+ in 2001.”⁽ⁱⁱ⁾ বর্তমানে কী রাজনৈতিক, কী সামাজিক, কী পারিবারিক – সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই বার্ধক্যে উপনীত ব্যক্তি সমাজে এক অভূতপূর্ব গুরুত্ব আকর্ষণ করে থাকে। তবে বার্ধক্য নিয়ে শুধুমাত্র বর্তমান দিনেই চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, তা নয়। হাজার হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষের বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যেও বার্ধক্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে দেখা যায়।⁽ⁱⁱⁱ⁾ প্রাচীন শাস্ত্রগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম বা দর্শনে বার্ধক্য নিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি আলোচনা করতে দেখা যায়। কারণ কার্যকারণ তত্ত্বে বিশ্বাসী গৌতম বুদ্ধ মানব জীবনকে দুঃখের হাত থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার অনুসন্ধানের জন্য দুঃখের স্বরূপ উদ্ঘাটন ও তা থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনে বার্ধক্য এক প্রকার দুঃখ,^(iv) তাই বার্ধক্যরূপ দুঃখ কি এবং এই দুঃখ থেকে কিভাবে

মুক্তি সম্ভব তার বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। বৌদ্ধদর্শনে বার্ধক্যকে কেন দুঃখ বলা হয়? বার্ধক্য কি সত্যিই দুঃখ?— এই সকল প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার হয় যদি বার্ধক্য লক্ষণ আলোচনা করা হয় (চৌধুরী ১৯৯৭; ৩১)। বার্ধক্য কোন দুঃখ নয়, বার্ধক্য দেহের ধর্ম,^(v) মানব জীবনের অনিবার্য এক পর্যায়ে। তবে বার্ধক্যের কিছু সমস্যা অবশ্যই আছে। বার্ধক্যের সমস্যা হল শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস, রূপহানি^(vi) প্রভৃতি। ভারতবর্ষে বর্তমান দিনে যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে যাওয়ায় একক পরিবারগুলিতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাব্যক্তিদের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ববিদ প্রশান্ত রায় বলেছেন— “এক দিকে যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া, অন্য দিকে চাকরি সূত্রে ছেলেমেয়েদের বাইরে চলে যাওয়া বয়স্কদের একাকিত্ব বাড়িয়ে তুলছে। আর দুষ্কৃতিরা এই সুযোগটিরই সদ্যবহার করছে। অশক্ত, মানসিক ভাবে কিছুটা ভেঙে পড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আস্থা অর্জন করা, নিশানা করাও সহজ। দুষ্কৃতিরা এখন এই অঙ্কটা কষেই এগোচ্ছে। কারণ তারা জানে যে এ ক্ষেত্রে প্রতিরোধের সম্ভাবনা খুবই কম”^(vii)। আধুনিক যুগে বৃদ্ধদের সংখ্যানুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একক পরিবারে বসবাসের জন্য পরিবার ও সমাজে তাদের কর্তৃত্ব কমেছে সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্গতা ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নিঃসঙ্গতা, নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে ওঠার জন্য বৃদ্ধাব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ ও সবল থাকতে হবে এবং এটা তখনই সম্ভব যখন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি অনুভব করবে যে, বার্ধক্য কোন অবহেলার বিষয় নয়, বার্ধক্য দুঃখ নয়; বার্ধক্য মানব জীবনের একটি স্তর মাত্র, বার্ধক্যই জীবনকে পূর্ণ করে। এই বার্ধক্যের ঐশ্বর্য, বা মূলধন অভিজ্ঞতা (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪১০; ৪৫৪), যা সমাজের মঙ্গলার্থে কাজে লাগাতে গেলে বার্ধক্যে সুস্থ থাকা খুব প্রয়োজন। এই সুস্থ থাকার উপায় ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র আয়ুর্বেদে (নাগ ২০০৩; ৯) উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বার্ধক্যকে দুঃখ ভেবে তার থেকে মুক্তির অন্বেষণ নয়। বরং বার্ধক্যে পাওয়া যায় একপ্রকার মুক্তির ছাড়পত্র, কারণ বার্ধক্যে পরিবারের বন্ধন কিছুটা শিথিল হয়ে যায় (Verma 1988, 76)। তাই বুলিতে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর সময় হল বার্ধক্য (চট্টোপাধ্যায়, রচনাবলী ৫৪), পরের জন্য, সমাজের জন্য স্বাধীনভাবে কিছু করার সময়ই হল বার্ধক্য। ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন শাস্ত্রে বার্ধক্যের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় (সিদ্ধান্তবাগীশ, মহাভারতম্)। এখনকার মনীষীদের (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) কণ্ঠেও এই কথাগুলি ধ্বনিত হতে দেখা যায়। সুতরাং বার্ধক্য কোন নৈরাশ্যজনক অবস্থা নয়, বার্ধক্য জীবনকে এক নতুন রূপ দেয়। এই প্রবন্ধে বার্ধক্যের এই নতুন রূপের আশ্বাদ নেওয়ার চেষ্টা করবো।

সৃষ্টি রহস্যে জরা বা বার্ধক্য অবশ্যম্ভাবী, এই চিরন্তন সত্য মানুষ বর্তমানে অনেকাংশেই গ্রহণ করে নিয়েছেন, তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বার্ধক্য নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে (বর্ধন ১৯৮৭; ১৪)। বার্ধক্যে বিভিন্ন সমস্যা আছে, এই সমস্যা আর সমাধান নিয়ে মনোবিদ্যায়, পরিসংখ্যানমূলক তত্ত্বের নিরিখে, সমাজতত্ত্বের নিরিখে বিভিন্ন রকমের গবেষণা চলছে; এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধও প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে। তবে উক্ত প্রবন্ধে ভারতের প্রাচীনশাস্ত্র ও বর্তমান ভারতীয় সমাজের নিরিখে বার্ধক্যের মুক্তির এক দার্শনিক প্রেক্ষিত দেওয়া হয়েছে। তবে এই মুক্তি দুঃখ থেকে মুক্তি নয়, যৌবন বা প্রৌঢ়ত্বে যে সুকঠিন দায়িত্ববোধ থাকে তা থেকে মুক্তি। জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত

হওয়ার ফলে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, তার আলোয় যে নতুন জীবনবোধ জাগ্রত হয় তা বার্ষিক্যকে দেয় জীবনে এগিয়ে চলার এক মুক্তির ছাড়পত্র। প্রকৃতপক্ষে এই প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য : ‘বার্ষিক্য’ জীবনের শেষ স্তর হলেও এই স্তরেই মানব জীবন পূর্ণতা পায়; ‘বার্ষিক্য’ দুঃখ নয়, অবহেলার নয়, অপ্রয়োজনীয় নয় এই উপলব্ধি করানো। বর্তমান সমাজে বৃদ্ধব্যক্তিদের সংখ্যানুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা ভীষণভাবে একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন, এমতাবস্থায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাব্যক্তিদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়; আর এই মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কাজ করা প্রয়োজন, নিজের সক্ষমতা বজায় রাখা প্রয়োজন। বার্ষিক্য মানবজীবনের একটি স্তর মাত্র; কিছু সমস্যা আছে, তাই বলে বার্ষিক্য দুঃখ নয়। বার্ষিক্য জীবনকে পূর্ণ করে, গভীরতা দেয়, অভিজ্ঞতার দরুণ বার্ষিক্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লব্ধ হয়। আর এই দৃষ্টিভঙ্গী-ই “মুক্তির ছাড়পত্র” বহন করে নিয়ে আসে। ‘মুক্তির ছাড়পত্র-বার্ষিক্য’ প্রবন্ধটি একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ, এটি মুখ্যত বিশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতামূলক একটি গবেষণা। এই গবেষণার কাজটি মূলত মুখ্য উৎস (primary source) ও গৌণ উৎসের (secondary source) উপর নির্ভর করে এবং কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা থেকে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দুঃখ থেকে মুক্তি: ভারতীয় প্রাচীনশাস্ত্রে বার্ষিক্যকে দুঃখ বলে সেই দুঃখ থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ করা হয়েছে। বার্ষিক্যকে কেন দুঃখ বলা হয়?— এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে বার্ষিক্য কাকে বলে জানতে হবে। হাজার হাজার বছর পূর্বে ঋগ্বেদে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলের ১৭৯তম সূক্তের ১ম ঋকে লোপামুদ্রা বলেছেন— “জরা শরীরের সৌন্দর্য নাশ করিতেছে”। এছাড়াও অন্যত্র বলা হয়েছে— “জরা যেরূপ রূপ বিনাশ করে তুমি সেইরূপ শম্বরের নগরসমূহ বিনাশ করিয়াছিলে” (৪/১৬/১৩)। যৌবন বা কৈশোরের রূপ বার্ষিক্যে থাকে না, তাই ঋগ্বেদে বার বার-ই বলতে দেখা যায় বার্ষিক্য যৌবনের রূপের বিনাশ সাধন করে। ঋগ্বেদে জরা শক্তি, রূপ ক্ষয় করে বলে জরা প্রদানকারী ভগবান ইন্দ্রের কাছে জরা থেকে রক্ষা করার প্রার্থনা করতে দেখা যায়।^(viii) সূত্রাং উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি, ঋগ্বেদ অনুযায়ী জরা বা বার্ষিক্য হল মানব জীবনের শেষ পর্যায়, যখন পুত্রের পুত্র উৎপাদন হয়, শরীর ও রূপ জীর্ণ হয় এবং মানবদেহে এই জরা প্রদানকারী দেবতা হল ইন্দ্র।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যায় যে, মানুষের শরীরকে ক্ষেত্ররূপে উল্লেখ করে, সেই ক্ষেত্র প্রসঙ্গে জরার আলোচনা করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেখানে তিনি ক্ষেত্রের গুণ বা বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে জরার উল্লেখ করেছেন। তিনি মোক্ষ সাক্ষাৎকারের অনুকূল পন্থা হিসাবে যাকে নির্দেশ করেছেন, সেটি হল ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে বৈরাগ্য, অহংকার না থাকা এবং জন্ম মৃত্যু জরা ব্যথিরূপ দুঃখাদি দোষের অনুদর্শন। এই দোষের অনুদর্শন প্রসঙ্গে আমরা জরার কথা পাই, সেখানে ব্যবহৃত ‘জরা’র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মধুসূদন সরস্বতী বলেন –

প্রজ্ঞাশক্তি তেজোনিরোধপরপরিভাদিরূপায়াং

ব্যাধিনাং জ্বাতিসারাদি রূপানাং ॥ (গীতা ১৩/৬-৮)

অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান, শক্তি এবং তেজ ক্ষয় হওয়া এবং পরপরিভব প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ অন্যের নিকট পরাভূত হওয়া বা নির্ভরশীল হওয়ার অবস্থাকেই জরা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

স্বাধ্বেদ এবং শ্রীমৎভাগবদ্ গীতা এই উভয় ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, জরা বলতে শারীরিক পরিবর্তনকেই চিহ্নিত করা হচ্ছে, যে অবস্থায় শরীরের মধ্য নানা ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং এই পরিবর্তনের অভিমুখ কিস্তি ক্ষয়ের দিকে। অর্থাৎ বার্ষিক্য জীবনের এমন একটি পর্যায়ে যেখানে ব্যক্তির শরীরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে যার ফলে, তার শক্তি হ্রাস পায়।

প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধ দর্শনে সব থেকে বেশী বার্ষিক্য নিয়ে আলোচনা পাওয়া যায় এবং এই বৌদ্ধ দর্শনে বার্ষিক্য বা জরাকে দুঃখ বলা হয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবনদর্শনের একটি প্রধান দিক দুঃখসত্য। তাঁর জীবন ও বাণীতে দুঃখের একটি নির্মম কঠোর রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জাতক নিদানে উল্লিখিত হয়েছে; মহাভিনিষ্ক্রমণের প্রাককালে যে তিনটি দৃশ্য রাজকুমার সিদ্ধার্থের জীবনে পরিবর্তন করে দিয়েছিল তার একটি হল জরাগ্রস্ত ব্যক্তির দর্শন। নগর পরিভ্রমণ কালে তাঁর চোখে পড়ে মানব জীবনের তিনটি অবস্থা— ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু। সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণ করতে গিয়ে এক জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে যখন সারথিকে প্রশ্ন করেন যে, ‘এ ব্যক্তি কে?’ কুমারের প্রশ্নের উত্তরে সারথি বলেন— “ইহা রূপবিনাশক, বলহানিকর, শোকেরআকর, সকল সন্তোষের অপহারক, স্মৃতিনাশক, ইন্দ্রিয়গণের রিপু – ইহার নাম জরা। এই জরা দ্বারা এই ব্যক্তি জীর্ণ হইয়াছে”। সারথি আরও জানায় জরা অবশ্যম্ভাবী, আজ যে শিশু, তারপর যুবা, তারপর সেও একদিন জরাপ্রাপ্ত হবে। এই সকল কথা শুনে এবং আনন্দিত জনগণকে দেখে কুমার সেই ক্ষণেই চিন্তিত হয়ে বলেছিলেন, মানুষ প্রত্যক্ষ করছে যে, জরা মানব জীবনে অনিবার্য; এই জরা মানুষের স্মৃতি, রূপ, শক্তি বিনাশ করে; তবু মানুষ আনন্দিত হচ্ছে, কোন উৎকণ্ঠা নেই!^(ix) চিরকাল রাজ ঐশ্বর্য ও রাজসুখে বড় হওয়া সিদ্ধার্থ এই দৃশ্য দেখে কাতর হয়ে পড়ে এবং মানুষের জীবনে দুঃখের অবশ্যম্ভবতাকে অনুভব করে। তাই তিনি গৃহত্যাগ করেন এই দুঃখের হাত থেকে সংসারকে কিভাবে পরিত্রাণ দেওয়া যায় তার অনুসন্ধান করতে। কার্যকারণ তত্ত্বে বিশ্বাসী বুদ্ধদেব এই জন্য প্রথমে দুঃখের স্বরূপ নির্ধারণ করেন ও তার কারণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হন। পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোন তত্ত্ব আলোচনার দ্বারা দুঃখমুক্তি সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কোন মানুষের দেহে যদি শরবিদ্ধ হয়, তবে দেহ থেকে শরটিকে না সরিয়ে, কে কতদূর থেকে তা নিক্ষেপ করেছে, সেটি দেহের মধ্যে কতটা গোঁথে আছে, তার গতিবেগ কেমন ছিল তা বিচার করা মূর্খামি বলে গণ্য হবে, তেমনি দুঃখ জর্জরিত মানুষের পক্ষেও দুঃখমুক্তির চেষ্টা না করে কেবল নিষ্ফল তত্ত্বালোচনা করাও সমানভাবেই মূর্খতার পরিচায়ক। মানুষের দুঃখ মোচনকেই এজন্য বুদ্ধদেব তাঁর জীবনের মহান ও একমাত্র ব্রত রূপে গণ্য করেন এবং দুঃখ নিবৃত্তির অন্বেষণে শুরু করেন। এই দুঃখকে দুভাগে ভাগ করা যায়— শারীরিক ও মানসিক দুঃখ। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু হলো শারীরিক দুঃখ এবং প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, ঈর্ষিতার অপ্রাপ্তি ও পঞ্চ উপাদান স্বল্প হলো মানসিক দুঃখ। অর্থাৎ জরা এক প্রকার শারীরিক দুঃখ।

এবারে প্রশ্ন হল বৌদ্ধ মতে এই দুঃখরূপ জরা কী? এই বিষয়ে গৌতম বুদ্ধের মত বিভিন্ন নিকায়গুলিতে

পাওয়া যায়। দীঘনিকায় বলা হয়েছে “*In what ever beings, of what ever group of beings there is aging, decrepitude, broken teeth, gray hair, wrinkled skin, shrinking with age, decay of the sense faculties that monks, is called aging*” (Mahasatipatthana Sutta 22.17)। এর থেকে বোঝা যায় যে, সমস্ত প্রাণীজগৎ সে যে শ্রেণীরই হোক, যে অবস্থায় শরীর জরাজীর্ণ হয়, দাঁত পড়ে যায়, চুল পেকে যায়, চামড়া কুঁচকে যায় এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয় গুলো তার ক্ষমতা হারায় তাকেই বার্ধক্য বলা হয়। মঝ্ঝিম নিকায় (Saccavibhanga Sutta 141.12) গ্রন্থেও একই ভাবে বার্ধক্য কি তা বলা হয়েছে। বুদ্ধের ভাষায় “যাতে সংতে সংসত্তানং তস্মিহতস্মিহ সত্তনিকায় জরাজীর্ণতা খন্ডিচ্ছং পলিচ্ছং বলিভুচতা আয়ুনো সংহানি ইন্দ্রিয়ানং পরিপাকো”^{২২}। অর্থাৎ জরা হচ্ছে এক প্রকার জীর্ণতা, বয়সের ভারে শরীরের মধ্যে ভাঙনধরা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে যাওয়া। জরাগ্রস্ত হলে ব্যক্তির শরীরের উপরশিরা-উপশিরা ভেসে উঠে, গাত্রচর্ম শিথিল ও শুষ্ক হয়ে যায়। আয়ু শেষ হয়ে আসে, ইন্দ্রিয়সমূহ পরিপক্ব হয়। যেমন চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, কর্ণের শ্রবণশক্তি কমে যায়, নাসিকা কুণ্ঠিত হয়, জিহ্বায় রস আশ্বাদন ক্ষমতা কমে যায়, দেহ নামক যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। গৌতম বুদ্ধ জরার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় জরা হচ্ছে শরীরের ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকা বা ধীরে ধীরে ক্ষয় হওয়া, শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো স্বাভাবিক কাজকর্ম করার ক্ষমতা হারানো এবং তা আর ফিরে পাওয়ার আশা না থাকা। সেই জন্য এই অবস্থাকে জীবনের অন্তিম লগ্ন বলা হয়। অর্থাৎ যিনি বৃদ্ধ, বয়স্ক, বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত তিনি জীবনের শেষ সময়ে উপনীত।

জরা বা বার্ধক্যের স্বরূপ বিষয়ে গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের কাছে গল্পগাথার মাধ্যমেও নানা উপদেশ দিয়েছেন। ধর্মপদের জরাবর্গে ১৪৮ নম্বর গাথায় গৌতম বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছিলেন—

পরিজিন্নমিদং রূপং রোগনিড়ড়ং পভঙ্গুরং

ভিজ্জতি পুতিসন্দেহো মরণন্তং হি জীবিতং ॥১৪৮॥

অর্থাৎ এই শরীর ব্যাধির আশ্রয়স্থল, ভঙ্গুর, পুঁতি বস্তুপিণ্ড রূপ এই দেহ ভেঙে যায়; মৃত্যুতেই জীবনের অবসান হয়। এই শরীরের কোন স্থায়িত্ব নেই। সময়ই মানুষকে দুর্বীর গতিতে নিয়ে যায় শৈশব থেকে বাল্য, বাল্য থেকে যৌবন, আর যৌবন থেকে বার্ধক্য, আর বার্ধক্য থেকে বিনাশের দিকে, মৃত্যুর দেশে। তাই অনিত্যতা দেহের ধর্ম। রোগ, শোক, জরা, যন্ত্রণা দেহেরই নিত্যসঙ্গী। প্রাণীদের জীবন, মৃত্যুর আগে পর্যন্তই বিদ্যমান এবং মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। ধর্মপদের অন্য একটি গাথায় গৌতম বুদ্ধ তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের পত্নী রূপনন্দাকে বলেছিলেন – “দেহ যেন অস্থি দ্বারা তৈরী এক নগর, যার বাইরের দিক রক্তমাংসের প্রলেপ। এই নগরের মধ্যে অবস্থান করছে জরা, মৃত্যু, অভিমান আর কাপট্য” ॥১৫০॥ কাঠ দিয়ে কাঠামো প্রস্তুত করে লতা দিয়ে বেঁধে মাটির প্রলেপ দিয়ে যেমন শস্যভান্ডার প্রস্তুত করে তাতে ধান, মুগ প্রভৃতি শস্য রাখা হয়, তেমনি সত্যিকারের দৃষ্টি দিয়ে এই দেহের গভীরে তাকালে দেখা যাবে একটা হাড়ের কাঠামোর উপর চামড়ার আবরণ দিয়ে ও রক্তমাংসের প্রলেপ দিয়ে এই স্থূল দেহ গঠিত। এই দেহকে আশ্রয় করে আছে ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু।

এ প্রসঙ্গে তিনি জরাবর্গে অপর একটি গাথায় বলেছেন –

জীবন্তি বে রাজরথা সুচিন্তা অথো সরীরম্পি জরং উপেতি

সতঞ্চ ধম্মো ন জরং উপেতি, সন্তো হবে সব্ভি পবেদয়ন্তি।।১৫১।।

এর অর্থ হল – সুচিন্তিত রাজার রথও এক সময় জীর্ণ হয়ে যায়, তেমনি মানব শরীরও জরাগ্রস্ত হয়। কিন্তু সৎপুরুষের ধর্মের ক্ষয় নেই, সাধুরা পরস্পর ধর্মালোচনায় রত থাকেন। এর দ্বারা বোঝানো হয় যে, জরা কাউকেই রেহাই দেয় না। এই সমস্ত উপদেশ দ্বারা গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, জরা হল এক দুঃখদায়ক অবস্থা, যার কবল থেকে রাজাও রক্ষা করতে পারে না। গৃহত্যাগের পূর্বে গৌতম বুদ্ধ যখন পিতার কাছ থেকে গৃহত্যাগের অনুমতি নিতে যান, তখন পিতা বলেন যে, ‘এ বয়স ধর্মাচরণের নয়’, তখন তিনি তাঁর পিতাকে উত্তরে বলেছিলেন যে, যদি চারটি বিষয় রোধ করতে পারেন তবে সে ধর্মাচরণ থেকে বিরত থাকবে; এই চারটি বিষয় হল জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও বিপত্তি।^(xi) কোন রাজা জরা, মৃত্যু, ব্যাধি থেকে কোন ব্যক্তিকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। গৌতম বুদ্ধ জীবনের এই অবশ্যম্ভাবী দুঃখ থেকে জীবজগৎকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি দুঃখের কারণ নির্ণয় করে, তা থেকে মুক্তি কিভাবে সম্ভব সেই পথের অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁর মতে জরা রূপ দুঃখের কারণ জন্ম। জন্ম না থাকলে জরা-মরণও থাকে না। আমরা সংসারে জন্মগ্রহণ না করলে সাংসারিক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না, বার্ষিক্য ও তার পরিণতি রূপে মৃত্যুও আসতো না। এইজন্যই বলা হয়েছে – “জাতি পচ্ছয়া জরামরণং”। বৌদ্ধ ধর্মে পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু প্রবাহকে সংসার বলা হয়। গৌতম বুদ্ধ এই সংসার প্রবাহের ১২টি কারণের উল্লেখ করেছেন, যাকে দ্বাদশনিদান বলা হয়। যেমন – অবিদ্যা-সংস্কার-বিজ্ঞান-নামরূপ-ষড়ায়তন-স্পর্শ-বেদনা-তৃষ্ণা-উপাদান-ভব-জাতি বা জন্ম-জরা-মরণ। এই দ্বাদশনিদানচক্রের শুরুতে অবিদ্যা আর শেষে আছে বার্ষিক্য জনিত মৃত্যু। যখন প্রকৃত জ্ঞান হয় তখন অবিদ্যা চলে যায়। অবিদ্যা নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধ হলে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়, এইভাবে বিজ্ঞান জন্য নামরূপ, নামরূপ জন্য ষড়ায়তন, ষড়ায়তন জন্য স্পর্শ, স্পর্শ জন্য বেদনা, বেদনা জন্য তৃষ্ণা, তৃষ্ণা জন্য উপাদান, উপাদান জন্য ভব, ভব নিরোধ হলে জন্ম নিরোধ হবে, আর জন্ম নিরোধ হলে জরা, মরণ নিরোধ হবে। এর থেকে বোঝা যায়, অবিদ্যা দূর হলেই এই পুনর্জন্ম চক্রের এই বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। বৌদ্ধ মতে অষ্টাঙ্গিক মার্গ পালন করলে অবিদ্যা দূরীভূত হয় এবং পুনর্জন্মের এই চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং অষ্টাঙ্গিক মার্গই জরারূপ দুঃখের নিরোধের পথ।

বৌদ্ধ দর্শনে জরারূপ দুঃখের অবসান করতে জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহের বিনাশের কথা বলা হয়েছে। অবিদ্যার নাশ এবং তার ফলে জন্ম মৃত্যুরূপ প্রবাহের বিনাশ সাধন ঘটবে। তবে সমাজে অবস্থিত সকল মানুষের পক্ষে এটি কখনই সম্ভব নয়, আর যদি সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে সমাজ বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এক সময়। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেকে দুঃখের এইরূপ বিনাশ সাধনকে বৌদ্ধধর্মের হীনবল হয়ে পড়ার কারণ রূপে উল্লেখ করেছেন।^(xii) কারণ জন্ম মৃত্যু প্রবাহের বিনাশ ঘটলে, সমাজেরও বিনাশ ঘটবে। তাই এইরূপে জরারূপ দুঃখের নাশ বেশির ভাগ সাধারণ মানুষের কাছে কাম্য নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ

মুক্তি বা নির্বাণের দিকে তেমন ভাবে আকৃষ্ট হয় না। তারা সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করে বাঁচতে চায়, এই পৃথিবীর সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে চায়। সাধারণ মানুষ অনেকেই বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বেই (যেহেতু বার্ধক্যে শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস পায়) বার্ধক্যকে দুঃখজনক অবস্থা বলে কল্পনা করে নেয় এবং তার ফলে তারা বার্ধক্যে উপনীত হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু বার্ধক্য মানবজীবনের একটি দৈহিক অনিবার্য স্তর মাত্র। বার্ধক্যে পূর্বের শক্তি, রূপ হয়তো থাকে না; এছাড়াও বার্ধক্যে আরও কিছু সমস্যা থাকে। মানবজীবনের প্রত্যেক স্তরেই কিছু না কিছু সমস্যা থাকে, যেমন শৈশব, শৈশবেও বিভিন্ন রকম সমস্যা থাকে। ঠিক তেমনই বার্ধক্যেও বিভিন্ন সমস্যা থাকে, তাই বলে বার্ধক্য দুঃখ নয়। বরং বার্ধক্য মানব জীবনের এক অবশ্যম্ভাব্য পরিণতি একথা মনে নিয়েও বার্ধক্যে কিভাবে সুস্থ থাকা যায় তার চেষ্টা করাই শ্রেয়। অর্থাৎ বার্ধক্যকে দুঃখ মনে করে তা থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ না করে, বার্ধক্যের দুঃখ অক্ষমতাকে কি ভাবে দূরীভূত করা যায় তার চেষ্টা করাই ভালো। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র আয়ুর্বেদে সে সম্পর্কে বহু আলোচনা পাওয়া যায়।

বার্ধক্যে সুস্থ থাকার উপায়: যে শাস্ত্র দ্বারা আয়ুর বিষয় জানতে পারা যায়, তার নাম আয়ুর্বেদ। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তির সুখায়ু কি দুঃখায়ু, হিতায়ু কি অহিতায়ু, তার আয়ুর পরিমাণ অর্থাৎ তিনি স্বল্পায়ু, মধ্যায়ু না দীর্ঘায়ু? তিনি জীবনে সুখী কি দুঃখী? তিনি স্বাস্থ্যবান হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবেন, না রোগযুক্ত আয়ু ভোগ করবেন? যে শাস্ত্র পাঠ করে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে পুংখাপুংখরূপে বিচার করা যায় এবং অবগত হতে পারা যায় তার নাম আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। অর্থাৎ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মানুষের আয়ু সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ অনুসারে সমস্ত সৃষ্টির মূলে কারণ হিসাবে বিদ্যমান ৯টি দ্রব্য। এগুলি হল পঞ্চ মহাভূত, মন, কাল, আত্মা এবং দিক। এই পঞ্চমহাভূত যে কোন সৃষ্ট বস্তুর প্রকাশের মূল ভিত্তি। এই সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর সমন্বয়েই জগৎ বা বিশ্ব গঠিত হয়। এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রক হিসাবে যে দুটি মূল দ্রব্য কাজ করে তা হল কাল ও দিক। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে কালের সঙ্গে মানুষের যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়, যার শুরু গর্ভাবস্থায় এবং পরিসমাপ্তি মৃত্যু, তাই আয়ু নামে পরিচিত। কালের প্রতিক্রিয়া বশতই আয়ু থাকাকালীন সময়ে মানুষের শরীরে নানা ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় এবং এই পরিবর্তন গুলো স্বাভাবিক ও কোনভাবেই তার ব্যতিক্রম হয় না। শরীরের মধ্যে যে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তদানুসারে মানুষের আয়ুষ্কালকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়ে থাকে আয়ুর্বেদে। চরকসংহিতা বলা হয়েছে—“বাল্য, মধ্য, ও জীর্ণ বা বার্ধক্য ভেদে মানবের অবস্থা বিভক্ত হইয়া থাকে, সেই অবস্থা আবার কালের পরিমাণ বিশেষ দ্বারা নির্ণীত হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে জরা বা বার্ধক্যে ত্রিধাতুর সাম্যাবস্থার বিনাশ ঘটে, তাই শরীর জীর্ণ হয়, বিভিন্ন রোগের উদ্বোধ ঘটে। যদিও চরক সংহিতায় বলা হয়েছে –

কালস্য পরিণামেন জরামৃত্যুনিমিত্তজাঃ।

রোগাঃ স্বাভাবিকা দৃষ্টাঃ স্বভাবো নিষ্প্রতিক্রিয়াঃ।।

অর্থাৎ জরা মৃত্যু প্রভৃতি অনিমিত্তজ বিকার, যা কালপরিণামে উপস্থিত হয়। এগুলি স্বাভাবিক রোগ বলে

নির্দিষ্ট স্বভাবের প্রতিকার করা যায় না, এই সকল স্বাভাবিক রোগের কোন চিকিৎসা হয় না। এ থেকে অনুমান করা যায় যে জরা নামক স্বাভাবিক ব্যাধির কথা বলা হয়েছে তাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ জরা মানব জীবনের এক অবশ্যম্ভাব্য পরিণতি, যাকে রোধ করা সম্ভব নয়। আয়ুর্বেদ মতে জরা বা বার্ধক্যের অন্যতম কারণ হল কাল। কালই দৈহিক পরিবর্তন সাধন করে, যার অবশ্যম্ভাব্য পরিণতি হল বার্ধক্য। একটি বিশেষ কাল প্রাপ্ত হবার পর থেকেই বৃদ্ধাবস্থার সূচনা ঘটে এবং এই বৃদ্ধাবস্থা কখনও খুব ধীরে ধীরে আসে আবার কখনো অতিক্রান্ত গতিতে এগিয়ে আসে। এই হার নির্ভর করে চারপাশের পরিবেশের উপকরণের উপরে। এর থেকে বলা যায় যে, কাল বা সময়কে ধরে রাখা যায় না, একই ভাবে বার্ধক্যকেও রোধ করা যায় না। তবে চারপাশের পরিস্থিতিতে অনুকূল করে বার্ধক্যকে ধীর গতি সম্পন্ন করা সম্ভব। বার্ধক্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার কথা আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে কাঠ, পাথর, লোহার দ্বারা একটা কল নির্মিত হয় ও বাতাস, আগুন ও জল দ্বারা সেই কল চলতে থাকে, সেইরকম রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র – এই সাতটি উপকরণের দ্বারা দেহ গঠিত হয়, আর বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতুর দ্বারা এই দেহ চালিত হয় অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম নির্বাহ হয়। এই তিন ধাতুর প্রকৃতস্থ অবস্থায় শরীর কর্মপটু ও সজীব থাকে। কিন্তু ত্রিধাতুর অনিয়ম হলে শরীর অসুস্থ হয়। বার্ধক্যে এই ত্রিধাতুর অনিয়ম দেখা যায়। চরক সংহিতায় বলা হয়েছে, “জীর্ণ বা বার্কক্যাবস্থায় ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল, বীৰ্য্য, পৌরুষ, পরাক্রম, গ্রহণ, ধারণ, স্মরণ, বচন, ও বিজ্ঞান ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, ধাতুগুণভ্রংশ এবং বায়ু প্রধান হইয়া, শতবর্ষ পর্যন্ত এই অবস্থা থাকে”।^১ সুতরাং দেখা যায় চরক সংহিতা অনুযায়ী ৬০ বছরের পর মানবজীবনে বার্ধক্য আসে। এই অবস্থায় ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল, বীৰ্য্য প্রমুখ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং বায়ু প্রাধান্য পায়। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “*In the later years, we see Vayu aattacking the bones and memory of the elderly. simply by considering age factors, a person can stay healthy and balanced, avoiding the problems that caome with age*”।^২ শুক্রসংহিতায়ও বলা হয়েছে – “বয়স তিন প্রকার বাল্য, মধ্য ও বার্ধক্য। সত্তর বৎসরের পর ধাতু প্রভৃতি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন বলি পলিত ও কাস শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব আসিয়া দেখা দেয়, কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য থাকে না এবং শরীর জীর্ণগৃহের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থাকে বার্ধক্য বলে। বাল্যকালে শ্লেষ্মা, মধ্যবয়সে পিত্ত এবং বার্ধক্যে বায়ু বৃদ্ধি পায়, চিকিৎসা করিবার সময়ে এই বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক”।^৩ শুক্রসংহিতায় দেখা যাচ্ছে মানব জীবনে ৭০ বৎসর বয়সে বার্ধক্য আসার কথা বলা হয়েছে। তবে এখানেও বার্ধক্যে ধাতু প্রভৃতি ক্ষয়প্রাপ্ত ও বায়ুর প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। বায়ু বৃদ্ধি পাওয়াতে ধাতু সাম্যবস্থার নাশ হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে ধাতুর সাম্যাবস্থা নাশই সকল রোগের কারণ। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে “*These three governing principles are nothing but energy themselves, they can be influenced –increased or decreased – by like or opposite energies. Heat increases pitta, dryness increases vata, and liquid increases kapha, etc. Thus imbalance is the continued experience of some stimulus – mental, emotional, or physical, real*

or imagined that overwhelms the body's ability to maintain its identity, its vata-pitta-kahpa ratio or prakruti. Amongst these Tridosas, Kahpa governs Balya, Pitta governs Madhya and Vata governs Vardhyaka”^৬ বার্ষিক্যে যে ধাতুর বৈষম্য ঘটে তা নিচের এই সারণীর মাধ্যমে দেখতে পারি :

দোষ বাল্যাবস্থা মধ্যাবস্থা বার্ষিক্যাবস্থা
কফা উচ্চ সাধারণ নিম্ন
পিত্ত সাধারণ উচ্চ সাধারণ
বায়ু নিম্ন নিম্ন উচ্চ

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চরক ও গুপ্তসংহিতার মতে জরা বা বার্ষিক্য নামক স্বাভাবিক অবস্থার কারণ ত্রিধাতুর বৈষম্য। বার্ষিক্যে মূলত বায়ুর প্রাধান্য ঘটে। চরক সংহিতায় বার বার বলতে দেখা যায় শরীরস্থ বায়ু প্রকুপিত হলে শরীর নানাবিধ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়; তখন শারীরিক বল, বর্ণ, সুখ, ও আয়ু প্রভৃতির বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তাহলে দেখা যায় কাল বার্ষিক্যের কারণ, কালকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় তাই বার্ষিক্যকে রোধ করাও সম্ভব নয়, বার্ষিক্য অনিবার্য স্বাভাবিক রোগ। তবে বার্ষিক্যের অক্ষমতা বা ক্ষয়ের কারণ ত্রিধাতুর অসাম্য বা বায়ুর প্রাধান্য, যাকে কিছুটা রোধ করা যায়। তাই বার্ষিক্যের শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়কে কিছুটা দমন করা সম্ভব হয়।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বার্ষিক্যে সুস্থ জীবনযাপন করার জন্য পৃথক একটি তন্ত্র রয়েছে, যাকে রসায়ন তন্ত্র বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা আয়ুর্বেদকে আটটি তন্ত্রে ভাগ করেছিলেন, যথা- শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভূত, অগদ, রসায়ন ও বাজীকরণ। এর মধ্যে রসায়নতন্ত্রে জরাবিনাশক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে “*Ayurveda is known to consider the phenomenon of aging from entirely a new angle. It also elaborates a comprehensive clinical discipline called Rasayana Tantra entirely devoted to the study of aging and its prevention with the help of Rasayana therapy*”^৭ অর্থাৎ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে তন্ত্রে জরা ব্যাধি বিনাশক ভেষজসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং বয়ঃস্থাপন, আয়ুর্বর্ধন মেধাজনন ও রোগ নিবারণ যাহার প্রতিপাদ্য বিষয় তাহাকে রসায়নতন্ত্র বলে। প্রাচীন কালেই অকাল বার্ষিক্য বলিপলিত ব্যাধি দূর করার উদ্দেশ্যে এই রসায়ন তন্ত্রের আবির্ভাব।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মূলত দুটি বিষয়- ১) প্রত্যেক ব্যক্তির সুস্থস্বাস্থ্যের জন্য পরিচর্যা করা, ও ২) অসুস্থ ব্যক্তির রোগ সারিয়ে তোলা। রসায়ন চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যক্তির সুস্থস্বাস্থ্য লাভের কথাই বলা হয়েছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বার্ষিক্যকে যেহেতু একপ্রকার রোগ বলা হয়েছে সেহেতু তার প্রতিষেধকের কথাও বলা হয়েছে। রসায়ন চিকিৎসাতে এ প্রসঙ্গে বহু আলোচনা করা হয়েছে। যেমন -

অভয়ামলকীয় রসায়নপাদে চ্যবনপ্রাশের উল্লেখ করা হয়েছে, এই চ্যবনপ্রাশ সেবন করলে বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদিত হয়। ফলে জরাগ্রস্ত ব্যক্তি নবযৌবন লাভ করে। চরকসংহিতায় চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করার পদ্ধতি

সম্বন্ধে বলা হয়েছে – “বেলগাছ, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, চারিপ্রকার পর্ণী অর্থাৎ শালপর্ণী, পুন্নিপর্ণী (চাকুলে), মুদগাপর্ণী (মুগানি) মাষপর্ণী (মাষানি), পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতীদ্বয় অর্থাৎ বৃহতি ও কন্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূম্যালকী (ভূই আমলা), দ্রাক্ষা (কিসমিস), জীবন্তী, পুষ্কর (কুড়), অণ্ডরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, শঠী, মুথা, পুনর্নবা, মেদা, ছোট এলাচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুণ্ডলাভ, বাসকমূল, কাকোলী ও কাকনাসিকা – ইহাদের প্রত্যেকের একপল করিয়া লইবে এবং পুটলিবন্ধ গোটা আমলকী পাঁচশত লইবে। এই সমুদয় একত্রে চৌষটি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোল সের থাকিতে নামাইয়া ক্লান্ত ছাঁকিয়া লইবে এবং পুটলিবন্ধ আমলকী সকল খুলিয়া বীজ ফেলিয়া দিয়া ছয়পল ঘৃত ও ছয়পল তিল তৈল একত্রে মিশাইয়া ভাজিয়া তাহা ঐ ক্লান্তে পুনর্বার পাক করিবে। পরে মিছরি অর্ধতুলা (স ছয়সের বা পঞ্চাশ পল) তাহাতে মিশ্রিত করিবে। লেহবৎ হইলে বংশলোচন চার পল, পিপুল দুই পল এবং গুড়ত্বক বা দারুচিনি, ছোট এলাচি, তেজপত্র ও নাগকেশর প্রত্যেকে এক এক পল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। ইহার নাম চ্যবনপ্রাশ”।^৮ অভয়ামলকীয় রসায়নপাদে এই রকম ছয় প্রকার দৃষ্টফল রসায়নযোগের কথা বলা হয়েছে, এই রসায়ন সেবনে বৃদ্ধ ব্যক্তি পুনর্বার যুবত্ব প্রাপ্ত হয়, শত বৎসর নীরোগে জীবিত থাকা যায়।

চরকসংহিতায় দ্বিতীয় রসায়নপাদ প্রাণকামী রসায়নপাদেও কি ভাবে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় সে কথা বলা হয়েছে। এই রসায়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে – “এই রসায়ন দ্বিতীয় অমৃতের ন্যায় দেবতাদিগেরও হিতকর, অচিন্ত্য ও অদ্ভুত প্রভাব, আয়ুষ্য অরোগ্যকর, বয়ঃস্থাপন, নিদ্রা, তন্দ্রা, শ্রম, ক্লম, আলস্য ও দৌর্বল্যহর; বায়ুপিণ্ড ও কফের সমতাসাধক, স্থৈর্যকর, মাংস শৈথিল্যহর, অন্তরাগ্নির উদ্দীপনকর, এবং প্রভাব বর্ণ ও স্বরের উৎকর্ষজনক”।^৯ এই সকল রসায়ন সেবনের ফলে ত্রিধাতু সমতা লাভ করে। বার্ষিক্যজনিত রোগের কারণ যেহেতু ত্রিধাতুর অসমতা, তাই এই রসায়ন সেবনে বার্ষিক্য জনিত রোগ থেকে কিছুটা নিরাময় সম্ভব, অর্থাৎ বার্ষিক্যে সুস্থ ও সক্ষম থাকা সম্ভব এবং এই রসায়ন সেবনে মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করে। এছাড়া আরও চ্যবনপ্রাশ ও রসায়নের উল্লেখ আছে যা সেবনে বার্ষিক্যে সুস্থ ও সক্ষম থাকা সম্ভব।

শুশ্রূত সংহিতায়ও বার্ষিক্যে দৈহিক অক্ষমতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, স্মৃতিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একাধিক চিকিৎসা, ঔষধ, মালিশের কথা বলা হয়েছে।^(xiii)

বার্ষিক্যে উপনীত ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য: বার্ষিক্য মানব জীবনের এক অনিবার্য পরিণতি যা সম্পূর্ণ রোধ করা সম্ভব নয়; একথা ঠিক, তাই বলে বার্ষিক্য দুঃখ^(xiv) বলে পরিত্যজ্য নয়। বৌদ্ধ দর্শনে বার্ষিক্যকে দুঃখ মনে করে সেই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তার থেকে বার্ষিক্যে কি ভাবে সুস্থ জীবন যাপন করা যায় সে দিকে দৃষ্টিপাত করাই শ্রেয়। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এই নিয়ে বিসদ আলোচনা করা হয়েছে। এ কথা আমরা কখনই অস্বীকার করতে পারি না যে, বার্ষিক্যবশত শারীরিক ও মানসিক ক্ষয় উপস্থিত হয়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী এই ক্ষয়কে ধীর গতি করে, সক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব। এখন প্রশ্ন হল একজন বৃদ্ধ মানুষ জীবনের শেষ প্রান্তে, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বার্ষিক্যে

কি উদ্দেশ্যে সুস্থভাবে বাঁচতে চাইবে? সাধারণভাবে একজন বৃদ্ধব্যক্তি মনে করেন সমাজে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, যেহেতু তিনি শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কি হবে—এটা একটা বড় প্রশ্ন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৃদ্ধব্যক্তিদের বরাবরই এক সম্মানের আসনে বসানো হয়, প্রাচীন বিভিন্ন শাস্ত্রেও বৃদ্ধব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনে করতে দেখা যায়, বৃদ্ধদের জন্য একাধিক সুযোগ সুবিধা উল্লেখ করতে দেখতে পাওয়া যায়। এর মূল কারণ বার্ষিক্যের মূল ধন অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকে সমাজ ও পরিবারের মঙ্গলার্থে কাজে লাগানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাজেই বৃদ্ধ হলেই তাঁর প্রয়োজন ফুরায়, একথা ঠিক নয়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা থাকার দরুন পরিবারের কর্তা বা কর্তী হতেন পরিবারের বয়োঃজ্যেষ্ঠ্য বৃদ্ধব্যক্তিগণ, পরিবারে তাঁদের অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হত। সমাজেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধব্যক্তিদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে দেখা যায়।^(xv) জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করার ফলে বার্ষিক্যে মানুষের কাছে যে ধন থাকে সেটি হল অভিজ্ঞতা, যা মানুষ অন্য কোন ভাবে অর্জন করতে পারে না। অভিজ্ঞতা সময় বা কালের দান, বৃদ্ধ ব্যক্তিরাই একমাত্র এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। প্রাচীনকালে বৃদ্ধব্যক্তির গৃহের প্রতি সকল কর্তব্য কর্ম সমাধান করে, পুত্রের হাতে সকল দায়িত্ব সমর্পণ করে বনে গমন করতেন। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— *“Having already satisfied his worldly interests, the vanaprasthi is advised to be motivated not by sex or procreative and acquisitive desires and other allurements of life. He is to live a life of retirement from family obligations, but not from social obligations”*.^{১০} বানপ্রস্থশ্রমে বনে গমন করে এক কঠোর সংযমের মধ্যে জীবন যাপন করার কথা বলা হয়েছে, এছাড়াও বলা হয়েছে এই স্তরে পরিবারের প্রতি সকল কর্তব্য সম্পন্ন করলেও সমাজের প্রতি সকল কর্তব্য সম্পন্ন করা হয় না। অর্থাৎ বার্ষিক্যে জীবন যাপন কেবল নিজের জন্য নয়, সমাজের মঙ্গলার্থে নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর উত্তম সময়। ভারতীয় শাস্ত্রে তাই বার বার বানপ্রস্থশ্রমের প্রয়োজনীয়তা কথা বলা হয়েছে। বানপ্রস্থশ্রমের পরবর্তী স্তর সন্ন্যাসাশ্রম। এই আশ্রম প্রসঙ্গে রাখাক্ষণ বলেছেন – *“The sannyasin is a super-social man, a parivrajaka, a wandering teacher who influences spirit standards though he may live apart from society”*.^{১১} সুতরাং দেখা যাচ্ছে জীবনের শেষ দুটি স্তর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম সামাজিক প্রয়োজনীয়তা আছে। মনুর সমাজব্যবস্থায়ও বৃদ্ধব্যক্তিকে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে দেখা যায়। সামাজিক দায়িত্ব বলতে নিজের মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে সমাজের উন্নয়নের কাজে লাগানোর দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে।

অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখেও এই একই কথা শুনতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রকৃত কাজ হল পরের জন্য কোনো কাজ করা। আর বার্ষিক্যই হল সেই কাজের প্রকৃত সময়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—“যৌবন কর্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভালো হয় না, একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ, দ্বেষ, ভোগাসক্তি এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধান তাহা সতত হীনপ্রভ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য

সেই কার্যকারিতার সময়। এইজন্য আমার পরামর্শ যে, বুড়া হইয়াছি বলিয়া, কেহ স্বকার্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভান করিবে না। বার্ষিক্যেও বিষয় চিন্তা করিবে”^{১১}। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপলব্ধি ‘একা’ নিবন্ধেও দেখতে পাওয়া যায়। “এই গভীরতর উপলব্ধি আসলে বঙ্কিমেরই প্রৌঢ় ঋতুর ফসল। এর মধ্যে আছে একদিকে উপনিষদের আত্মজ্ঞান বা আত্মপ্রসার, অপরদিকে পাশ্চাত্য মানবত্বের এক অপূর্ব সমন্বয়। যৌবনের আনন্দ আশার রঙিন কাচের অপেক্ষা রাখে। ভিত্তিহীন যুক্তিহীন অলীক স্বপ্ন রচনায় বিভোর যৌবনে যে স্ফূর্তির যোগান থাকে, বেশি বয়সে তা আর থাকে না বটে, কিন্তু পরিবর্তে এই সংসারের যে কঠিন অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয় তাই থেকে মানুষ আরো লাভবান হতে পারে”^{১২}। একথা সত্য যে, একজন ব্যক্তির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর জীবনবোধ জাগ্রত হয়। যৌবনে অনেক বন্ধনের মধ্যে কাজ করতে হয়, আর সে সময় অভিজ্ঞতা কম থাকায় সেই গভীর জীবনবোধ জাগ্রত হয় না। অপরদিকে বার্ষিক্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে এবং জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে থাকে। ফলে বার্ষিক্য কাজের উপযুক্ত সময়, যখন ব্যক্তি পরের জন্য কিছু করতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যৌবনে নিজের জন্য কাজ করা হয়েছে, বার্ষিক্য নিজের অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধকে সমাজের কল্যাণে লাগানোর সময়।^(xvi) একথা শুনে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, বার্ষিক্য কি নিজের কাজ থাকে না? নিজের কাজ কি শেষ হয়ে যায়? কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, মানুষের জীবনের আয়ু লক্ষবর্ষ হলেও নিজের কাজ করা শেষ হবে না। তাই তিনি বলেছেন – “বার্ষিক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর”^{১৩}। বঙ্কিমচন্দ্র বার বার বলেছেন পরের জন্য কাজ করেই আনন্দ পাওয়া যায়। তাই আমরা বলতে পারি বার্ষিক্যে আনন্দ পাওয়ার পথ হল পরের জন্য কিছু করা। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন বার্ষিক্য মানব জীবনের এক অনিবার্য অবস্থা, তাকে দুঃখ ভেবে সমাজ থেকে দূরে না থেকে, বরং বার্ষিক্যের অভিজ্ঞতাকে সমাজের মঙ্গলের কাজে লাগানো। তাই তিনি নিজে বলেছেন “বৃদ্ধ তার অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের সাহায্যে মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এই হল যথার্থ মুনিবৃত্তি”^{১৪}। সমাজের জন্য কাজের করার মাধ্যমেই বার্ষিক্যের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করা যায়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের মতে নিজেকে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার সময়ই বার্ষিক্য। তার প্রধান কারণ বার্ষিক্য এমন একটা সময় সে অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, সমাজকে তাঁর মূল্যবান মতামত দিতে সে সক্ষম। অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের অপর এক মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি জীবনের শেষ (৮০ বছর পর্যন্ত) সময়ে উপনীত হয়ে উপলব্ধি করেছেন যে, বার্ষিক্য মানব জীবনের এক পরিণত অবস্থা। এ প্রসঙ্গে ‘আরোগ্য’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন – “যৌবনের তেজ যখন প্রখর ছিল, ভাবতুম বার্ষিক্যটা একটা অভাবাত্মক দশা অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে সমস্ত শক্তি হ্রাস হয়ে সেই দশা মৃত্যু সূচনা করে। কিন্তু আজ আমি এর ভাবাত্মক দিকটি ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারছি। সত্তার যে বহিরঙ্গ, যাকে আমরা অহং নাম দিতে পারি, তার থেকে শ্রদ্ধা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। ঠিক মনে হচ্ছে, যেমন পরিণত ফল তার বাহিরের খোসাতে আর আসক্ত হয়ে থাকে না, সেই খোসাটা ক্রমশ তার পরে নিরর্থক হয়ে ওঠে। তখন তার প্রধান সম্পদ হয় ভিতরের শস্য। কাঁচা অবস্থায় সেই শস্যের পরিণত রূপ সে অনুভব করতে পারে না, এইজন্যে তাকে বিশ্বাস করে না। তখন সে

আপনার বাহিরের পরিচয়েই বাহিরে পরিচিত হতে চেষ্টা করে, সেখানে কোনো আঘাত পেলে সে পরম ক্ষোভের বিষয় বলে মনে করে। বৃদ্ধ বয়সে তার বিপরীত দশা ঘটে। সে অন্তরের পূর্ণতার মধ্যে আপনাকে যত উপলব্ধি করতে পারে ততই একটা পরম আশ্বাস লাভ করে এবং ততই বাহিরের ক্ষতি অথবা অসম্মান আর ক্ষুব্ধ করতে পারে না”। কবি বার্ষিক্যে অন্তরের পূর্ণতার কথা বলেছেন। অভিজ্ঞতার দরুণ বার্ষিক্যে এই পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে থাকে। তখন বাহিরের ছোটখাটো বিষয় তাকে স্পর্শ করতে পারে না, তাই বার্ষিক্য কাজ করার সময়, অবসাদগ্রস্ত হয়ে থেমে যাওয়ার সময় নয়। কবি নিজে তাই জীবনের শেষ বয়সে উপনীত হয়েও কাজ করে গেছেন। তাই বলা যায় বার্ষিক্য দুঃখ নয়, বার্ষিক্য অন্তরের পূর্ণতাকে উপলব্ধি করার সময়।

উপসংহার: উপরের আলোচনা থেকে একথা বলতে পারা যায়, বার্ষিক্য মানব জীবনের অনিবার্য পরিণতি, একে রোধ করা সম্ভব নয়। মানব জীবনের প্রত্যেক পর্যায়ে কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে, বার্ষিক্য যেহেতু জীবনের শেষ পর্যায় সেহেতু এই স্তরেও শারীরিক ও মানসিক কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে। বার্ষিক্যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন মূলত শারীরিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয়কে সূচিত করে থাকে। এটি মানব জীবনের অনিবার্য পরিণতি, তাই বার্ষিক্য নিয়ে দুঃখ করে কোন লাভ নেই। জীবন গতিময়, আর এই এগিয়ে চলার নামই জীবন। জরা বা বার্ষিক্য যেমন অনিবার্য, বার্ষিক্যের পরই মৃত্যুও জীবনে অনিবার্য। জরা ও মৃত্যুকে দুঃখ ভেবে এই জগৎ সংসার থেকে অবসাদগ্রস্ত হওয়া মূর্খতা। প্রকৃতপক্ষে এই জগৎ আনন্দময়, এই জগতে দুঃখ আছে আবার সুখও আছে, পূর্ণতা আছে আবার অপূর্ণতাও আছে। এইসব নিয়ে জগত সংসার সুন্দর, আনন্দময়। বার্ষিক্যে শারীরিক ক্ষয় হয়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই ক্ষয় রোধের কথা বলা হলেও ক্ষয়ের সম্পূর্ণ রোধ করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। বার্ষিক্যে এই সকল নঞর্থক দিক যেমন আছে, একইভাবে বার্ষিক্যের সদর্থক দিকও আছে। বার্ষিক্যের শারীরিক ক্ষয়, রূপের বিনাশ যেমন আছে, তেমনই অভিজ্ঞতা দ্বারা অন্তরের পূর্ণতাও আছে; আর এই অন্তরের পূর্ণতাই বার্ষিক্যের সদর্থক দিক। উপনিষদে জগৎ ও জীবনকে আনন্দময় বলা হয়েছে – “আনন্দাচ্চৈব খঙ্কিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি চ”। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন জীবনে সুখ ও দুঃখ দুটোই আছে, এই দুটো একত্রে আনন্দ। একইভাবে বলা যায় জীবনও আছে, মৃত্যুও আছে, এদের মধ্যে জরাও আছে – এইসব নিয়েই জীবন আর জীবন আনন্দময় ঈশ্বরের দান। দুঃখ আছে তো জীবন সচল, সবুজ, দুঃখহীন সুখ তো শুধু মরুভূমি। একই ভাবে জরাহীন জীবনও মরুভূমি সম। কবির মতে ‘শোকহীন হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি’ কাম্য নয়। স্বর্গ তাঁর কাছে পরিত্যজ্য কারণ সেখানে দুঃখ নেই, ব্যথা নেই। কবির ভাষায় –

থাকো স্বর্গে হাস্য মুখে, করো সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান –
মোরা পরবাসী, মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি-তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে

কেহ তার ছেড়ে যায় দু’দন্ডের তরে।
 স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
 মর্তে থাক সুখে দুঃখে অনন্তনিশ্চিন্ত
 প্রেমধারা”। (স্বর্গ হইতে বিদায়, চিত্রা)

সুতরাং সুখ, দুঃখ নিয়েই যেমন জগৎ সংসার তেমনই যৌবনের তেজ, রূপ, বার্ধক্যের শারীরিক অক্ষমতা, অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রাপ্ত বিজ্ঞতা— এই নিয়েই জীবন। সব নিয়েই জীবনের পূর্ণতা, তাই বার্ধক্য কোনভাবেই পরিত্যজ্য নয়, জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অভিজ্ঞতা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে বার্ধক্য জীবন সেই সার্থক উপলব্ধির আলোয় নিজেকে ও সংসারকে দীপ্তিমান করে তোলে। তাই বার্ধক্য দুঃখ নয়, বার্ধক্যই মানব জীবনে পূর্ণতা আনে, মানুষকে পরিণত করে। যৌবনে অনেক দায়িত্ব, কর্তব্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, অনেক প্রতিকূলতা থাকে যেমন, তেমন-ই থাকে অস্থিরতা। যৌবনে অভিজ্ঞতা কম থাকায় একের পর এক বাঁধা বন্ধন এসে উপস্থিত হয়; বার্ধক্য নিয়ে আসে এই সকল বাঁধা বন্ধন থেকে মুক্তি, এ মুক্তি মনের, স্বাধীন চিন্তার, মুক্ত ভাবনার ছাড়পত্র।

বর্তমান দিনে সমাজবিজ্ঞানে বার্ধক্যসংক্রান্ত কিছু মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়, এর মধ্যে প্রধান দুটি হল: নিবৃত্তিমূলক মতবাদ ও প্রবৃত্তিমূলক মতবাদ। সমাজ মনে করে, বার্ধক্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে মানুষের দায়দায়িত্ব কর্মভার কমিয়ে দেওয়া দরকার। এই নিবৃত্তিমূলক (Disengagement)^{১৭} মতবাদ বৃদ্ধ মানুষকে সমাজ থেকে ধীরে ধীরে বিছিন্ন করে দেয়। এই মতবাদের প্রবক্তা কামিং এবং হেনরী মনে করেন, জরা ব্যাধি ও মৃত্যুজনিত ঘটনাগুলি বৃদ্ধব্যক্তিদের মনে সামাজিক সম্পর্কবোধের শিথিলতা জাগ্রত করে থাকে। নিবৃত্তিমূলক মতবাদের বিরুদ্ধ ভাবনা হল হ্যাভিংহাউস্টের প্রবৃত্তিমূলক (Activity theory)^{১৮} মতবাদ। বার্ধক্যের প্রবৃত্তিমূলক চিন্তাধারায় বিশ্বাস করা হয় যে, পরিণত বয়সের এই বিশেষ পর্যায়ে মানুষ জীবনে ‘স্বর্ণযুগ’ সৃষ্টি করতে পারে। সেই সময়ে মানুষকে তৃপ্তিদায়ক কাজকর্মের দায়দায়িত্ব থেকে বাধ্যতামূলকভাবে নিবৃত্তি করলে বার্ধক্যের অতৃপ্তি এবং অস্বস্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে বার্ধক্য স্বাধীন চিন্তা বিকশিত করার সময়। বঙ্কিম চন্দ্র যেমন বলেছেন বুদ্ধি অপরিপক্ক, তার উপরে রাগ, দ্বেষ, ভোগ থাকে তাই যৌবন সঠিক কাজের সময় নয়, যৌবন নিজের কাজের সময়। বার্ধক্যই প্রকৃত কাজের সময়, কারণ বার্ধক্য অন্তরের পূর্ণতা আনে, গভীরতর জীবনবোধকে জাগ্রত করে। ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষিতে বা আদর্শের প্রেক্ষিতে বার্ধক্যের যে চিত্র আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যায় যে, ভারতীয় সমাজে বার্ধক্য সম্পর্কে প্রবৃত্তিমূলক (Activity theory) মতবাদটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে এবং তাতেই সমাজ ও বার্ধক্যে উপনীত মানুষ উভয়েরই সুবিধা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই উদাহরণই বার বার পাওয়া গেছে। বার্ধক্য মানুষের মনোজগতে এক বিশাল পরিবর্তন সাধিত করে। শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করে, মনের ইচ্ছাশক্তিকে অসীম অনন্ত গুণে বর্ধিত করার কুরুক্ষেত্র হল বার্ধক্য। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সমাজের বৃদ্ধব্যক্তিগণ পাল্লবপক্ষ, আর একদিন তাঁরা এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেই।

প্রান্তটীকা

[i] The 2001 census has shown that the elderly population (60+) of India accounted for 77 million and census 2011 projections indicate that elderly population has crossed the 100 million mark. It took more than 100 years for the aged population to double in most of the countries in the world, but in India it has doubled in just 20 years. (Agewell study on Human Rights of older persons in India, April 2011)

[ii] Citation: Bhagat, R.B and K. Kumar, 2011, 'Aging in India: Trend and Patterns' in Aging in India : Some Emergine Issues, Edited by K.N.S Yadava and Alok Kumar, Manak Publication, New Delhi, p 20

[iii] অথর্ববেদ সংহিতায় বলা হয়েছে—

স্বপ্নো বৈ তন্দ্রীর্নিধতিঃ পাপানো নাম দেবতাঃ।

জরা খালতং পালিতং শরীরমনু প্রাবিশন।। (১১/৪/৫/৯)

এর অর্থ হল— “নিদ্রা, অলসতা, পাপদেবতা নিধতি (দুর্গতি), ব্রহ্ম হত্যা পাপদেবতা পুরুষ শরীরে প্রবেশ করেছে; সেরূপ জরা, চিত্ত ও চক্ষুরাতির স্থলন, পলিতত্ত্ব প্রভৃতির অভিমাত্রী দেবগণ শরীরে প্রবেশ করেছিল”। ৭ এই শ্লোকে দেখতে পাওয়া যায় জরা বা বার্ধক্যে চিত্তের স্থলন হয়, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, দেহে পলিতত্ত্ব দেখা দেয় তাই এখানে বার্ধক্যকে পাপদেবতার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

[iv] “যত প্রকার দুঃখ আছে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বুদ্ধ ৮টি পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন, যেমন জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, ঈর্ষিতার অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং পশ্বেপাদান স্কন্ধময় এই দেহ ও মন দুঃখময়”। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, সুকোমল চৌধুরী, পৃঃ ২৮

[v] ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে – “স ক্রয়ান্নাস্য জরয়েতজ্জীর্য়তি ন বধেনাস্য হন্যতে এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পো... (৮/১/৫)। অর্থাৎ দেহই অনিত্য, আত্মা নয়। দেহ জরায়ুক্ত হলে যেমন আত্মা জরায়ুক্ত হয় না, তেমনি দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না।

[vi] ঋগ্বেদ সংহিতায় বলা হয়েছে, “জরা যেরূপ রূপ বিনাশ করে তুমি সেইরূপ শব্বরের নগরসমূহ বিনাশ করিয়াছিলে”(৪/১৬/১৩)

[vii] ‘এই সময়’ পত্রিকা, রবিবার, ৬ই জুলাই, ২০১৫

[viii] ঋগ্বেদের বলা হয়েছে – “আমাদিগের রক্ষার জন্য স্বয়ং জরারহিত, সমস্ত জগতের জরাপ্রদানকারী, সোমসিদ্ধ, সনাতন, তরুণবয়স্ক ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি”(২/১৬৩/১)।

[ix] বুদ্ধচরিত গ্রন্থে বলা হয়েছে, “জরা এইরূপ স্মৃতি, রূপ ও পরাক্রম নির্বিশেষে নষ্ট করে। লোকে এই রূপ জরাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে, তথাপি কোনোরূপ উৎকণ্ঠিত হইতেছে না”। (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অশ্বঘোষের)

[x] “..... some one is old, aged, burdend with years, advanced in life, come to the last stage”(Majjhima Nikaya, Ratthapala Sutta 82.32)।

[xi] “হে রাজন, আপনি যদি এই চারিটি বিষয়ে আমার প্রতিভূ হন, তাহা হইলেই আমি তপোবনের আশ্রয় গ্রহণ করিব না”।। (৫/৩৪) “জীবন আমার মরণান্তক হইবে না। রোগ আমার স্বাস্থ্য হরণ করিবে না। জরা যৌবনকে আকর্ষণ করিবে না। বিপত্তি আমার সম্পত্তি হরণ করিবে না”।। (৫/৩৫) এর দ্বারা বোঝা যায় যে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে রাজাও রোধ করতে পারবে না। (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অশ্বঘোষের)

[xii] “মানব জীবন অবিশিষ্ট দুঃখের আধার, আর জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে নির্বাণ লাভ বা মুক্তি লাভ করে মহাশূণ্যে মিলিয়ে যাওয়াই ধর্মের লক্ষ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের এই তত্ত্ব এদের ক্রমশ হীনবল হবার অন্যতম ঐতিহাসিক কারণ”। (জয়ন্তনুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মের ভবিষ্যৎ)

[xiii] “Old age and decay are held back for a very long time, provided, along with this treatment, the patient regularly anoints his body with anutaila, a medicinal oil of many ingredients, massages his body with a decoction of ajakarna (Vateria idica) bathes daily in well water saturated with usara (mineral salts), uses sandal paste on his body, and observes the rules of diet and conduct”. (Susruta Samhita, Priyadarshan Ray, Hirendranath Gupta, Indian National Science Academy)

[xiv] “According to the Hindu thinkers, old age is not a pitiable age” Social philosophy of the Mahabharata and the Manu Smriti, Pratima Verma

[xv] হাজার হাজার বছর পূর্বে মহাভারতের সমাজেও দেখতে পাওয়া যায় বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর কথা। নারদমুনি যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, “হে পৃথানন্দন! আপনি ঔষধ বা কোন নিয়ম অবলম্বন করিয়া শারীরিক পীড়া এবং বৃদ্ধের উপদেশ নিয়া মানসিক পীড়া দূর করিয়া থাকেন তো?”। হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ, মহাভারতম্ (সভাপর্ব)

[xvi] এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- “যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য; তারপর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ” (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বুড়া বয়সের কথা)

নির্দেশিকা

ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ. ১৩৯৬. অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, পৃষ্ঠা-৪৩।

চৌধুরী, সুকোমল. ১৯৯৭. গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৩১।

নাগ, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র. ২০০৩. চরকসংহিতা(প্রথম খন্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৭৩।

Tirtha, Swami Sada Shiva. 1998. The Ayurveda Encyclopedia, Sri Satguru Publications, Delhi.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ. ২০১৪. সুশ্রুত, বঙ্গীয়কলা বিদ্যালয়, কলকাতা-৭৩।

Basu, Soumitra. 1995. 'Concept of ageing in ayurveda', Ageing & Society, Vol XXII, P 27-44.

Dwivedi, K.K. Paul and M. 1991. 'The Concept of Aging in India', Ancient Science of Life, Vol XII, 1993, p 377-387.

নাগ, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র. ২০০৩. চরকসংহিতা (তৃতীয় খন্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৯।

নাগ, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র. ২০০৩. চরকসংহিতা (তৃতীয় খন্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-১১।

Verma, Pratima. 1988. Social Philosophy of The Mahabharata and The Manu Smriti, Classical Publishing Company, New Delhi.

Radhakrishnan, S. 1968. Religion and Culture. Delhi, Orient Paper backs.

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. 'বুড়া বয়সের কথা', বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-৫৪।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. 'একা', বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-১২।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. 'বুড়া বয়সের কথা', বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-৫৪।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. 'বুড়া বয়সের কথা', বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-৫৪।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. ১৪১৭. কালান্তর, 'আরোগ্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, পৃষ্ঠা-৪০২।

Cumming. E and Henry. W. 1961. Growing Old: The Process of Disengagement, Basic Book.

Havghurst R. J. Neugarten B. L. and Tobin S. S. 1968. Disengagement and Patterns of Aging, Chicago University Press, p 161-172.

প্রস্তাবিত গ্রন্থাবলী

দত্ত, রমেশচন্দ্র. ১৯৭৬. ঋগবেদ সংহিতা (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা ৭।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. ১৪১১. জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. ১৪১৭. কালান্তর, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. শান্তিনিকেতন. বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতকুমার. চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ, কলকাতা-৩২।

বর্ধন, অসীম. ১৯৮৭. বার্ষিক্য ও সমাজমন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু. ১৪১০. মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৫

Devis, Kinsley. 1951. The Population of India and Pakistan, Princeton University Press, Princeton.

Minois, George. 1989. History of old age : From Antiquity to the Renaissance, Polity Press.

Maddox, L. George. 1987. The Encyclopedia of Aging, Springer Publishing Company, New York.

Tilak, S. 1989. Religion and aging in the Indian Tradition, New York.

লেখক পরিচিতি:

অধ্যাপিকা, ফকির চাঁদ কলেজ

বিভাগ- দর্শন

ই-মেইল : sharmibasus2010@gmail.com